মুখোশ

স্টাফরুমে ঢোকার আগেই ত্রিদিব প্রফেসার দেবের গলার আওয়াজ পেলো। ক্লান্ত ভারী গলায় একটানা কথা বলে চলেছেন। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো ত্রিদিব। প্রফেসর দেবের সামনে তরুণ লেকচারার গোপাল চক্রবর্তী চোখে মুখে বিনীত একাগ্রতা ফুটিয়ে বসে আছে। ত্রিদিব একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো।

প্রফেসার দেব ঘোলাটে দৃষ্টিতে ত্রিদিবের পানে চেয়ে বললেন "বোস। বম্বের সিনেমার কথা হ'চ্ছে। .....তারপর এত কান্ডের পর নায়ক নায়িকার মিলন হ'ল। হলঘরে আলো জ্বলে উঠলো। ইন্টারভ্যাল। ভাবলাম গল্প তো শেষই হয়ে গেল, তবে আর ইন্টারভ্যাল কেন? ক'মিনিট পর আবার ছবি শুরু। শেষ হয় নি, নতুন করে প্লট ঘন হ'চ্ছে আরও।

"বিয়ের আসর থেকে কনে উধাও। খোঁজ খোঁজ রব চারিদিকে। সারা লঙ্কা খুঁজে হিরো গিয়ে পৌঁছলো মঙ্গোলিয়ায়। হবু বৌ তার বন্দিনী সেখানে। অনেক যুদ্ধ টুদ্ধ করে একাহাতে উদ্ধার করলো তাকে। কনে নিয়ে ফিরে যাবে এমন সময় সে রাজ্যের কেউকেটারা এসে করজোড়ে ঘিরে দাঁড়ালো। প্রকাশ করলো হিরোইনের জন্ম রহস্য। কনাট প্লেসের এই টাইপিস্ট মহিলা আসলে নাকি মঙ্গোলিয়ার রাজকন্যা এবং সেদেশের সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারিনী। ছোট্টবেলায় এক ছেলেধরা চুরি করে নিয়ে গিয়ে দিল্লীর কোন নিঃসন্তান দম্পতিকে বেচে দিয়েছিল। চলো, তাই সই। মঙ্গোল রাজকন্যার হাত ধরে আমাদের গরীব কেরানী হিরো দেশে ফিরছে সেদেশের শাসনভার একজন প্রতিনিধির হাতে সঁপে, এমন সময় দূরে কাড়া নাকাড়া বেজে উঠলো।

"এস্কিমোদের দেশ আক্রমণ করেছে এক দুর্ধর্ষ দস্যুদল। এস্কিমোদের দেশে ঘোর অরাজকতা। ওদের রাজা নাকি সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে

আসে বহু বছর আগে। সম্প্রতি বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেছে রাজার সেই সন্ন্যাস নাকি বেশীদিন টেঁকেনি, তাঁকে তপোভ্রষ্ট করে ছেড়েছিল কোন বনচারিনী। এর অনতিকাল পরেই তিনি গতায়ু হন ---- আত্মগ্লানিতেই সম্ভবত। তবে রাজার ক্ষণিক পদস্খলনে উদ্ভূত সন্তান এখনও বর্তমান এবং আমাদের এই হিরোই সেই আত্মবিস্মৃত রাজকুমার। কেরানীই হোক আর যাই হোক পিতৃভূমির ডাক উপেক্ষা করতে পারলো না সে। রাজকন্যে সমেত উঠলো গিয়ে সেই তুষারপুরীতে। সেখানে গিয়ে দেখে ব্যাপার জটিল। দস্যুদল আর কেউ নয়, মঙ্গোল রাজবংশেরই জ্ঞাতিগুষ্টি, হিরোইনের দূরসম্পর্কের আত্মীয়েরা সব। হিরোইনকে দেখেই এস্কিমোদের ঠান্ডা রক্ত চড়াৎ করে গরম হয়ে উঠলো, বিশেষকরে যখন তারা জানতে পেলো যে ওদের অত সাধের রাজপুত্র ওই শত্রুবংশের মেয়েটাকে পাশে নিয়েই সিংহাসনে বসতে চায়। লাও ঠ্যালা। বাইরে ডাকাতের দল তুষার প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে, আর এদিকে প্রাসাদের মধ্যে ক্রমাগত ষড়যন্ত্রের প্যাঁচ কষছে ঘরের শত্রুরা।

"আড়াই টাকার টিকিটের দাম উশুল হয়ে গেছে, আর বেশীক্ষণ বসলে হিতে বিপরীত হবে, মাথার ঘিলু-টিলু চল্‌কে বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে একটা --- এই ভেবে চেয়ার ছেড়ে গুটি গুটি দরজার দিকে এগুচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে শার্টের খুঁটে টান পড়লো। ফিরে দেখি সিনেমা হলের পরিচারক। বললো, 'দরোয়াজা লক্ কর দিয়া হ্যায়। পুরা পিকচার নহী দেখকর বাহর যানেকা হুকুম নহী হ্যায়।' একি জুলুম! যত বলি যথেষ্ট হয়েছে, এই বার দোর খুলে দাও, বাড়ি যাই, ও কেবলি বলে 'হুকুম নহী হ্যায়। পুরা পিকচার দেখনা পড়েগা।' অগত্যা আবার সিটে গিয়ে বসলাম।

"ইতিমধ্যে গল্প অনেকটা এগিয়ে গেছে। দেখি বোঁ-বোঁ করে এরোপ্লেন ঘুরছে বরফের প্রাসাদের উপর। প্যারাসুটে করে সিপাই নামছে। ডাকাতরাও চটপট জামাকাপড় পাল্টে অন্য পোষাক পরে ফেললো, এস্কিমোগুলোও। চারিদিকে পিলপিল করছে পুলিস। পাশের ভদ্রলোকের কনুই নেড়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার মশাই, অত পুলিস কোত্থেকে এলো?' ভদ্রলোক বললেন, 'আমেরিকা থেকে। হিরো আসলে ভিলেন। চরস আর মারিউয়ানার চোরা কারবার করতো। এতদিনে ধরা পড়লো। এস্কিমো আর মঙ্গোল সেজেছিল যারা, তারা আসলে ইন্টারপোলের

ডিটেকটিভ। ওকে ধরার জন্য জাল পেতেছিল ----।' হলে আলো জ্বলে উঠলো। দর্শকরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত শুনতে লাগলো। তারপর টলতে টলতে বেরিয়ে এলো পাশের দরজাগুলো দিয়ে।"

ততক্ষণে আরও ক'জন লেকচারার এসে গেছে।

সুধাংশু দত্ত হাসতে হাসতে বললো, "সারের হিন্দী সিনেমার উপর ভীষণ রাগ। সত্যি, যা সব গাঁজাখুরি বই এক একখানা দেখায়----।"

প্রফেসার দেব মাথা নেড়ে বললেন, "তোমাদের ভুল ধারণা ওটা। বম্বের সিনেমার থেকেও তাজ্জব ব্যাপার আমাদের চোখের সামনে ঘটে যায়। পার্থক্য এই যে জীবননাট্যের ঘটনাচক্র উদ্‌ঘাটিত হতে অনেক বেশী সময় নেয়। তথ্যগুলো একটু একটু করে সামনে আসে। পুরো ব্যাপারটার অসামঞ্জস্য তাই লোকের চোখে পড়ে না।"

রেজিস্টার হাতে উঠে দাঁড়ালেন। থার্ড ইয়ারের ক্লাস নিতে হ'বে তাঁকে। পর্দা সরিয়ে বাইরে বেরোলেন, কাঁধ দু'টো সামনের দিকে ইষৎ ঝুঁকিয়ে। ত্রিদিবের মনে হ'ল গত ক'মাসের মধ্যে হঠাৎ যেন বড্ড বেশী বুড়িয়ে গেছেন উনি।

প্রফেসার দেব বাইরে যেতেই তরুণ অধ্যাপকরা আর একটু খোলামেলা হয়ে বসলো। সিগারেটের প্যাকেটগুলো আত্মপ্রকাশ করলো এতক্ষণে।

চক্রবর্তীর হাতে লাইটারটা ফেরৎ দিতে দিতে ত্রিদিব অভিযোগের কণ্ঠে বললো, "আপনার কি রকম আক্কেল মশাই? এই সাত সকালে সারকে সিনেমার গল্পের জন্য ধরেছিলেন?"

চক্রবর্তী বিরক্ত হয়ে বললো, "বয়ে গেছে আমার গল্প শুনতে। জানেন আজ আমি ব্রেকফাস্ট মিস্ করেছি! ভেবেছিলাম ক্যান্টিন থেকে কিছু খেয়ে নেবো। তা এমন চেপে ধরলেন ভদ্রলোক এক ছ্যাদাড়ে গল্প নিয়ে। আপনার আর কি মশাই, ক'দিন বাদেই অফিসার হয়ে চলে যাবেন। আমাদেরই সারাজীবন কাটাতে হ'বে এখানে। সারাদিন ধরে একপাল ছেলের সামনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা চিরে রক্ত বার করবো, আর ফ্রি পিরিয়ডে বুড়োহাবড়া প্রফেসারদের প্রলাপ শুনে শুনে কানের পোকা নড়ে যাবে। কি চমৎকার প্রসপেক্ট!"

চক্রবর্তী বিরস মুখে ত্রিদিবের কাছ থেকে চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিয়ে

অন্য দিকে মুখ করে ওরই দেওয়া সিগারেটে টান মারতে লাগলো।

ত্রিদিব সুধাংশুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো, "স্টেশনে গেছিলে নাকি?"

সুধাংশু বললো, "হ্যাঁ। আমি আর ধীরেশ গেছিলাম। ধীরেশ আবার একরাশ ফুল-টুল নিয়ে গেছিল। অরবিন্দের বউয়ের হাতে দিলো। আমার কেমন খারাপ লাগছিল। বউ মরার তিন মাসের মধ্যে বিয়ে করে বসলো অরবিন্দটা। তা আবার ঘটা করে হানিমুন করতে যাওয়া। বড্ড যেন বাড়াবাড়ি।"

ত্রিদিব সংক্ষেপে বললো, "প্রথম বিয়েটাও লভ-ম্যারেজ ছিল। ইন্টারকাস্ট। অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছিল ----। এ বৌ কেমন দেখলে?"

সুধাংশু কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে চুপ করে রইলো মুহূর্তকাল। তারপর বললো, "বাতিকগ্রস্ত মহিলা। সেপ্টেম্বর মাসে শাল-টাল জড়িয়ে ঘেমে একসা ----।"

স্টাফরুমে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। বাইরে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনতে পেলেন প্রফেসার দেব। আজ ক্লাসে যেতে কোনও উৎসাহ নেই তাঁর। কোন কিছুতেই যেন উৎসাহ পাচ্ছেন না আর। আসলে চক্রবর্তী ঠিকই বলেছে। বুড়োহাবড়াই বলা উচিৎ ওঁকে। শুধু গলার জোরে সময়ের গতি আটকানো যায়না। আর নয়, এবার ছুটি নেবার সময় এসেছে তাঁর। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ক্লান্ত পায়ে ধীরে ধীরে ক্লাসরুমের দিকে এগিয়ে চললেন প্রফেসার দেব ----।

সন্ধ্যাবেলা দোতলার বারান্দায় বসে সদ্য শেষ করা চিঠির পাতাগুলো খামে ভরতে ভরতে বারে বারে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন প্রফেসার দেব। ড্রয়ার থেকে স্ট্যাম্পের ডিবেটা বার করে আরও ক'টা স্ট্যাম্প সাঁটলেন খামে। তারপর খামটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। রাস্তার ওপাশে লাল লেটার বক্সটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাঁকে। কিন্তু না। এখুনি চিঠিটা পোস্ট করার ইচ্ছে দমন করতে হ'বে। সাধারণ ডাকে নয়, রেজিস্ট্রি করে পাঠাবেন ওটা। যাতে খোয়া যাবার কোনও সম্ভাবনা না থাকে। ও চিঠি খোয়া গেলে চলবে না। ----

দরজায় টোকা পড়লো। দরজা ঠেলে মেসের ছোকরা চাকর ঘরে ঢুকলো। চায়ের সরন্জাম টেবিলে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল আবার। টি-পট থেকে কবোষ্ণ পানীয় কাপে ঢেলে দুধ চিনি মিশিয়ে এক চুমুক খেয়ে একটু থামলেন। তারপর বিস্বাদ ওষুধ খাওয়ার ভঙ্গিতে এক নিঃশ্বাসে গলাধঃকরণ করলেন পুরোটা। ঠান্ডা চা তাঁর দু'চক্ষের বিষ। কিন্তু উপায় নেই, আজীবনের অভ্যাস ---- সময়মত চা না পেলেই চড়াৎ করে মাথা ধরে যায়। তবে আর বেশীদিন নয়। সামনের ছুটির পর আর ফিরছেন না এখানে। চার বছর আগেই রিটায়ার করার কথা ছিল। প্রাইভেট কলেজ। বছর বছর এক্সটেনশনের জোরে টিকে আছেন এখনও। কিন্তু আর নয়। শরীর ও মন দুইই বিশ্রাম চায়। এবার সত্যিই রিটায়ার করবেন।

ঝাড়গ্রামের জমিটার একপাশে ছোট্ট বাড়ি তুলবেন আর বাকি জমিটায় বাগান। প্রিন্সিপালকে আভাস দিয়ে রেখেছেন। ভয় নিজের মনকে। চায়ের মত কলেজটাও অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে ---- তিরিশ বছরের অভ্যাস। শুধু কলেজ নয়, গোটা শহরটাই তাঁর চোখের সামনে গড়ে উঠেছে বলতে গেলে। আর ওই ছোকরাগুলো, যারা আজ ওঁকে বুড়োহাবড়া আখ্যা দেয়, ওদের অনেককেই খালি গায়ে ইজের পরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন উনি। অরবিন্দ আর ত্রিদিব মাত্র ক'বছর আগেও ওঁর ছাত্র ছিল। অরবিন্দের প্রথম বৌ অলকাও .....।

দরজায় টোকা পড়লো আবার।

"ভিতরে এসো।"

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো ত্রিদিব। হাতে একখানা খাম।

খামটা ওঁর হাতে দিয়ে বললো, "কলেজ থেকে ফিরেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলাম সার। সোমবার জয়েন করতে হ'বে। প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করেছি। বললেন এত ভাল চাকরি, উনি আমায় আটকে রেখে আমার প্রস্পেক্ট নষ্ট করতে চান না। সেদিন ইন্টারভিউ দিতে যাবার সময় আপনি বলেছিলেন এ চাকরি আমার কেউ মারতে পারবে না, আমি পাবোই। আমি কিন্তু সেদিন খুব একটা ভরসা পাচ্ছিলাম না সার। চারিদিকেই তো 'পুলের' ব্যাপার আজকাল। শেষপর্যন্ত কিন্তু আপনার কথাই ফললো।"

প্রফেসার দেব অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা খুঁটিয়ে পড়তে লাগলেন। ত্রিদিব অন্যমনস্কভাবে টেবিলের উপর প্রফেসার দেব খানিক আগে যে খামটা রেখেছিলেন সেটা হাতে তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে আবার রেখে দিলো।

দেব বললেন, "হুঁ। মাইনে পত্তর খুবই ভাল। অ্যালাউন্স ট্যালাউন্স মিলিয়ে এখানে যা পাচ্ছিলে তার ডবল। তাছাড়া ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করতে পারবে।"

ত্রিদিব বললো "চলি সার। যাওয়ার তোড় জোড় করি এখন থেকে। ক'দিন বাদে ছুটির মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা এলে একটু সুবিধে হ'ত।"

তারপর হঠাৎ কি মনে পড়ায় বললো, "আপনার পুরোনো ফ্ল্যাট কিন্তু আবার খালি হয়েছে সার। বলেন তো খোঁজ করি। এখানে বড্ড অসুবিধে আপনার।"

দেব চোখে মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন, "খালি মানে? অরবিন্দ কোথায় থাকবে?"

"ওরা ও বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে সার। প্রিয়দর্শিনী পার্কে ফ্ল্যাট নিয়েছে। শ্রীনগর থেকে ফিরে ওখানেই উঠবে। বললো পুরোনো বাড়িতে অলকার হাজার স্মৃতি ছড়িয়ে অছে, ওখানে গেলে তাকে হারানোর ব্যথা অহরহ বুকে বাজবে।"

প্রফেসার দেব শুকনো গলায় বললেন, "প্রিয়দর্শিনী পার্কের ফ্ল্যাটগুলোর ভীষণ চাহিদা শুনেছি। অনেক আগে থেকে আগাম টাগাম দিয়ে রাখতে হয়। অরবিন্দের কপাল ভাল, বেশ ফট্ করে পেয়ে গেল তো ! তোমরাই ছুটোছুটি করে জোগাড় করে দিলে বুঝি?"

"না সার, ফ্ল্যাটটা ও নিজেই জোগাড় করেছে।"

ত্রিদিব প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে প্রফেসার দেব দরজায় খিল তুলে দিলেন। টেবিলের কাছে এসে পুরু খামটা তুলে নিলেন হাতে। ভাগ্যিস তাড়াহুড়ো করে পোস্ট করে বসেন নি। এখনও শেষ হয়নি চিঠিটা। আরও কিছু যোগ করতে হ'বে এতে।

তিনমাস আগের একটা ঘটনা এখনও চোখের সামনে ভাসছে তাঁর। সে দিনটা ছিল রবিবার। সাধারণত ছুটির দিনে একটু বেলা করে ওঠেন উনি। সেদিন কিন্তু সাতটার মধ্যে তৈরী হয়ে গান্ধীচকে অরবিন্দের বাসায়

হাজির হয়েছিলেন। গত কয়েকদিন ধরে অনেক বিচার বিবেচনা করে শেষ অবধি এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে অরবিন্দের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অলকাকে সচেতন করে দেওয়া উচিত তাঁর। হয়তো অরবিন্দও ওখানে থাকবে। তারই মধ্যে যে কোন প্রকারে কথাটা পৌঁছে দিতে হবে অলকার কাছে। অরবিন্দ নিশ্চয়ই জানবে যে উনিই বলেছেন, কারণ রঘুনাথপুরের সেই অখ্যাত হোটেলে মিস ভদ্রকে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে বাস করার কথা আর কেউ জানে না। অলকার মত অন্যরাও জানতো যে অরবিন্দ ট্রাঙ্ককলে তার বাবার হার্ট অ্যাটাকের খবর পেয়ে পুরুলিয়া গেছে মরণাপন্ন বাবাকে দেখতে, যে বাবা অলকার সঙ্গে বিয়ের পর তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন।

প্রফেসার দেবও তাই জেনেই সন্তুষ্ট থাকতেন যদি না নিয়তির চক্রান্তে রঘুনাথপুর ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্মে নেমে কুঁজোয় জল ভরার দুর্মতি হ'ত তাঁর এবং কুঁজো ভর্তি জল নিয়ে ট্রেন অবধি পৌঁছনোর আগেই যদি না ট্রেনটা ছেড়ে দিতো। ঘটনাটা ঘটেছিল অরবিন্দ পুরুলিয়া রওনা দেবার দিন দুই পরে। এক বিশিষ্ট বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে বন্ধুকন্যার বিবাহ উৎসবে যোগ দিতে চলেছেন প্রফেসার দেব, কলেজ থেকে দিন পাঁচেকের ছুটি নিয়ে। রঘুনাথপুরের নির্বান্ধব প্ল্যাটফর্মে কুঁজো হাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রফেসার দেবকে দন্ডায়মান ছেড়ে ট্রেনটা হুশ-হুশ করে ওঁর চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। ওঁর বাক্স-বিছানা যাবতীয় মালপত্র সেই ট্রেনে। উত্তেজনার মাথায় দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশুন্য হয়ে স্টেশনের বাইরে এসে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসলেন, ড্রাইভারকে পরবর্তী স্টেশনের পানে যথাশক্তি স্পীডে গাড়ী হাঁকানোর নির্দেশ দিয়ে। অল্পদূর গিয়ে ট্যাক্সি বিগড়োলো। ওঁরও বিচারশক্তি ফিরে এসেছে ততক্ষণে। ভাগ্যে টাকাকড়ি সঙ্গে ছিল, মনিব্যাগটা কক্ষনো কাছ-ছাড়া করেন না উনি। ট্যাক্সির পয়সা মিটিয়ে ড্রাইভার এবং পথচারীদের জিজ্ঞেস করে একটা ছোট সরাইখানার খোঁজ পেলেন। একখানা কুঠরি বুক করে তাঁর গন্তব্যস্থলে ট্রাঙ্ককল করলেন।

বন্ধুকে সরাসরি পাওয়া গেল না। তাঁর উদ্দেশে বিস্তৃত বারতা পাঠালেন। তাঁর ঝকমারি এবং ট্রেনে ছেড়ে আসা জিনিসপত্রের উল্লেখ করে বন্ধুকে সেগুলো ট্রেন থেকে নামিয়ে নিতে অনুরোধ জানালেন।

ট্রাঙ্ককল সেরে ঘরে এসে বিশ্রামের জোগাড় করছেন এমন সময়

পাশের ঘর থেকে বাংলা কথা শুনে ছোকরা চাকরটাকে শুধোলেন, "ও ঘরে কে থাকে?"

শুনলেন ও ঘরের বাসিন্দা সেন সাহেব ও তাঁর স্ত্রী নাকি এর আগেও অনেকবার এসে বাস করে গেছেন এখানে অল্প কয়েকদিন করে। চাকরটা বিছানাপত্তর ঠিকঠাক করে চলে গেল। প্রফেসার দেবের বিশ্রাম নেওয়া মাথায় উঠেছে তখন। পাশের ঘরের বাসিন্দারা সামনের বারান্দা পার হয়ে গেটের দিকে যাচ্ছে। দেখেই চিনতে পারলেন। সেনসাহেব আর কেউ নয়, তাঁরই প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান সহকর্মী অরবিন্দ মুখার্জি। হোটেলে স্ত্রী বলে চালিয়েছে যাকে সে মহিলাও একেবারে অপরিচিত নয়। ওঁদের শহরে একটি মেয়েদের স্কুলে টিচার ছিল কিছুকাল, বছর খানেক হ'ল অন্যত্র চলে গেছে। ওদের দু'জনকে নিয়ে অনেক কিছু কানাঘুষো শুনেছেন। মেয়েটি অর্থাৎ মিস ভদ্র শহর ছাড়ায় ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায় কিন্তু আসল ব্যাপার যে আরও অনেকদূর গড়িয়েছে আজই সেটা টের পেলেন।

এরপর থেকে ওই এক চিন্তা ঘুণের মত কুড়ে কুড়ে খেয়েছে তাঁকে। অলকাকে উনি স্নেহ করতেন। ওঁর ক্লাসের ছাত্রছাত্রিদের মধ্যে সবার সেরা ছিল সে। শেষপর্যন্ত অরবিন্দের মত ত্যাঁদোড়, ফন্দিবাজ লোকের পাল্লায় কেমন করে যে পড়লো মেয়েটা সেকথা ভেবে আজও অবাক হয়ে যান। তবু,অনেক ঝড়ঝাপটার পর যখন বিয়ে করে অরবিন্দকে নিয়ে ওঁর সামনে এসে দাঁড়ালো অলকা, প্রফেসার দেব বিনা দ্বিধায় কাছে টেনে নিলেন ওদের। অরবিন্দের কলেজের চাকরিটা শুধুমাত্র তাঁর চেষ্টাতেই হয়েছিল, নইলে অরবিন্দের মত নিস্প্রভ যোগ্যতা এবং সন্দেহজনক খ্যাতি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে ওই চাকরির স্বপ্ন দেখাও বাতুলতা ছিল। তাঁর ফ্ল্যাটের বড় অংশটা ছেড়ে দিয়েছিলেন ওদের। অলকার স্নেহযত্নে নিজের অসুবিধার কথা মনে থাকেনি আর। ওদের নতুন ঘরকন্নার সান্নিধ্য তাঁর নি:সঙ্গ, একক সংসারে দোলা দিয়ে গেল। অরবিন্দকেও স্নেহের চোখে দেখতে লাগলেন প্রফেসার দেব। ভাবলেন যতটা খারাপ মনে করতেন সত্যিই ছেলেটা তত খারাপ নয়। ভালবাসার আওতার বাইরে নয় অন্তত:।

এমনকি এরপর যখন অরবিন্দ ওঁকে নানাভাবে আভাসে ইঙ্গিতে বলতে লাগলো যে ওই ফ্ল্যাটখানা অলকার এত মনে ধরেছে যে সে

আর অন্য কোথাও যেতে নারাজ অথচ আর একখানা ঘর না পেলে কিছুতেই চলবেনা তাদের, তখন প্রফেসার দেব নির্বিবাদে নিজের অবশিষ্ট ছোট ঘরখানা ওদের হাতে তুলে দিয়ে এক ছন্নছাড়া মেসে গিয়ে উঠলেন। নিজের অসুবিধার কথা ভুলে ওদের আর একখানা ঘরের প্রয়োজনের পিছনে যে মধুর ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল তারই আনন্দে মশগুল হয়ে অনাগতের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন অগাধ বাৎসল্য ও মমতায়। কিন্তু রঘুনাথপুরের ওই ঘটনায় সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অরবিন্দের পুরোনো খ্যাতিটা যে একটুও অতিরন্জিত নয় মর্মে মর্মে বুঝলেন সে কথা। আরও বুঝলেন যে খোলস ছাড়লেও কেউটে সেই কেউটেই থাকে।

ওদের বাড়ির দরজার কাছে এসে একটু অস্বস্তি হ'তে লাগলো প্রফেসার দেবের। ছুটির দিন। ওরা হয়তো ঘুমোচ্ছে এখনও। কি যে ভাববে ওরা! যে কথাটা বলতে এসেছেন সেটা তো আর আগেই বলা চলবে না। তার জন্য সুযোগ খুঁজতে হ'বে, এবং ততক্ষণ পর্যন্ত আটপৌরে কথাবার্তায় ঢেকে রাখতে হ'বে তাঁর আগমনের গূঢ় উদ্দেশ্যটাকে। কথাটা অলকাকে একান্তে বলতে হ'বে। পুরো ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বলা না গেলেও অন্তত অলকার চোখ ফুটিয়ে দেওয়া দরকার। ---- বেশীক্ষণ ভাবতে হ'ল না। সামনের দরজা খুলে অরবিন্দ বেরিয়ে এলো। এরই মধ্যে দাড়ি কামিয়ে বাইরের পোষাক পরে নিয়েছে। পিছনে সুসজ্জিত অলকা।

ওঁকে দেখে দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠলো, "এই যে সার। এত সকালে?"

অলকা ঘরের ভিতর কয়েক পা পিছিয়ে আহ্বান জানালো, "আসুন সার, বসুন।"

ঘরের এককোনে একটা ছোট সুটকেস ও একটা বেতের ঝুড়ি। তার পাশে নীল রঙের বড় ফ্লাস্ক।

সেদিকে তাকিয়ে প্রফেসার দেব প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার? পিকনিকের প্রোগ্রাম মনে হচ্ছে !"

অরবিন্দ কুন্ঠিত হয়ে বললো, "হ্যাঁ সার। বল্লভপুরে যাচ্ছি আমরা। উইক এন্ডটা কাটিয়ে আসবো। আজকের দিনটা টুরিস্ট লজে কাটিয়ে কাল ভোরের ট্রেনে ফিরে আসবো ----।"

হাতঘড়ির দিকে তাকালো অরবিন্দ। দেব বললেন, "তোমাদের

বোধহয় ট্রেনের টাইম হয়ে এলো।"

অরবিন্দ বললো, "হ্যাঁ সার। আটটা পাঁচে ট্রেন। ভারী খারাপ লাগছে আমার। এতদিন বাদে এলেন, একটু বসতেও পারলেন না।"

একটু থেমে আবার বললো, "সামনের রোববার যদি ফ্রি থাকেন সার চলে আসবেন। গল্পগুজব করা যাবে। দুপুরে সেদিন এখানেই দু'টি ঝোলভাত খাবেন।"

অরবিন্দ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো। বোধহয় প্রফেসার দেবকে রাস্তা অবধি এগিয়ে দেবার জন্য।

অলকা বললো, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন সার, বসুন! ট্যাক্সি এলে তবে আমরা যাবো। আপনার মেস তো স্টেশনের পথেই পড়বে। যাবার সময় ড্রপ করে দেবো আপনাকে।"

চকিতে অরবিন্দের চোখেমুখে মেঘের ছায়া খেলে গেল। মুহূর্তের জন্য হলেও প্রফেসার দেবের চোখ এড়ালো না। পরমুহূর্তেই অরবিন্দ তার অভ্যস্ত গদ-গদ কন্ঠে বললো, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আমি তাহলে ট্যাক্সি ডাকতে যাচ্ছি।"

দ্রুতপদে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

ঘরে শুধু অলকা আর উনি। রঘুনাথপুরের ঘটনাটা তখনও বলতে পারতেন। বিস্তারিত বলার সময় না থাকুক অন্তত খানিকটা আভাস দিয়ে সতর্ক করতে পারতেন ওকে। কিন্তু তা করেননি প্রফেসার দেব। আসলে এমন পরিবেশে কিছুতেই মন সরেনি সেই অপ্রিয় ঘটনার কথা বলে মেয়েটার তাসের ঘর মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিতে। মনে মনে নিজেকে স্তোক দিলেন সামনের রবিবারের ঢালাও নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ করে। অনেক সময় পাওয়া যাবে সেদিন। বুঝেসুঝে ভেবেচিন্তে ভাঙবেন কথাটা। এখন এমন আচমকা বলার চাইতে সেটাই অনেক বেশী সমীচীন মনে হ'ল তাঁর।

অরবিন্দ চলে যেতে অলকা তার কথার পুনরুক্তি করে বললো, "সত্যি সার, আমার ভারী খারাপ লাগছে। এতদিন পরে এলেন আর আমরা ছুটলাম বল্লভপুর। এমনিতেও আমার এতটুকু যাবার ইচ্ছে ছিল না। আমি জানতামই না মোটে। ভোরবেলা ডেকে তুললো। বললাম,

রবিবার দিন এত তাড়া কিসের? বললো আটটার ট্রেনে বল্লভপুর যাচ্ছি আমরা। সব নাকি ব্যবস্থা করে রেখেছে আগে ভাগে। সব তাতেই ছেলেমানুষি ওর। বল্লভপুরে থাকার মধ্যে শুধু একটা নদী। ও সাঁতার কাটতে ভীষণ ভালবাসে। ওর ইচ্ছে আমিও সাঁতার কাটা শিখি। এই বয়সে কি আর নতুন করে কিছু শেখা যায়? তায় আবার কাল কাঁধে হঠাৎ কেমন ফিক্ লেগে গেল আচম্কা। ডান হাতটা নাড়তে পারছি না। অথচ না গেলে আবার মনে কষ্ট পাবে।"

প্রিয়দর্শিনী পার্কের ফ্ল্যাটের কথাও ওঁকে তখনই বলেছিল অলকা। খবরটা সে শুনেছিল তার এক পুরোনো বান্ধবীর কাছে। তারাও নাকি ওই ফ্ল্যাটখানার জন্য চেষ্টা করেছিল। বাড়িওলা বলেছে ও ফ্ল্যাট অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে, বর্তমান ভাড়াটে মাসদুই পর বাড়ি খালি করে গেলে অরবিন্দ মুখার্জি আসবেন ওখানে। উনি আগাম ভাড়া দিয়ে বাড়ি বুক্ করে রেখেছেন আগেভাগে।

অলকা কথাটা প্রফেসার দেবকে বলে ম্লান হেসেছিল। বলেছিল, ওমিথ্যেই আপনাকে এখান থেকে উৎখাত করলাম আমরা। কি যে ছেলেমানুষি ওর! ভাবছে প্রিয়দর্শিনী পার্কের মত 'পশ' জায়গায় আমায় নিয়ে তুললে খুশির আর সীমা থাকবে না আমার। আমায় কিচ্ছু বলে নি। একবারে সারপ্রাইজ দেবে। আমি যে জেনে গেছি আপনি যেন সেকথা ফাঁস করে দেবেন না সার।"

সারপ্রাইজই বটে। প্রিয়দর্শিনী পার্কে অরবিন্দ অলকা নয়, অনিমা ভদ্রকে নিয়ে সংসার পাতবে, একথা কি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিল অলকা? অথচ সেদিন অনিমার ব্যাপারটাই ওকে বলতে চেয়েছিলেন প্রফেসার দেব, কিন্তু কিছুতেই পারলেন না। মনমত সুযোগ পেলেন না। তাছাড়া সেটাই যে শেষ সুযোগ উনিও তো ভাবেন নি সে কথা ----।

এই সময় ওদের ধোপার ছেলে ধোয়া কাপড়ের বান্ডিল নিয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো। অলকা ওর হাত থেকে কাপড়গুলো নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে যন্ত্রনায় মুখ বিকৃত করে হাত সরিয়ে নিলো।

বললো, "বব্বন্, এক কাজ কর। তুইই ওগুলো ওঘরে রেখে আয় বাবা। ডান হাতখানা নাড়তে পারছি না মোটে।"

হ্যাঁ, বব্বনই নাম ছেলেটার। হয়তো পোষাকি নামও আছে একটা, কিন্তু বব্বন নামেও নিশ্চয় চিনবে লোকে।

সেদিন আর বেশী কিছু কথা হয়নি। একটু পরেই অরবিন্দ ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এলো এবং মেসের সামনে ওঁকে নামিয়ে দিয়ে স্টেশনে চলে গেল ওরা।

চলন্ত ট্যাক্সির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অলকা হাত নেড়ে বলেছিল, "সামনের রবিবার দেখা হ'বে। ভুলবেন না যেন !"

হায় কে জানতো যে সেটাই তার জীবনের শেষ রবিবার। প্রফেসার দেব ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে ওদের গমনপথের পানে চেয়ে রইলেন। অলকার টাঙাইল শাড়ির নীল আঁচলের ঝলক চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল, ট্যাক্সিটাও আর দেখা যায় না। মনে মনে বললেন, "আহা! সত্যের স্বরূপ চেনেনি এখনও ----।" সত্যের স্বরূপটা পুরোপুরি প্রফেসার দেবও জানতেন না সেদিন। পরে জেনেছেন। একটু একটু করে। অলকাকে যে কথা বলার জন্য গেছিলেন সে কথা কোনদিনই বলা হ'ল না আর। সোমবার কলেজে গিয়ে ওদের বল্লভপুর অভিযানের করুণ পরিণতির কথা শুনলেন। শুনলেন নদীতে সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে মরেছে অলকা। আর শোকসন্তপ্ত অরবিন্দ সোজা পুরুলিয়া চলে গেছে এই দারুণ আঘাতে তার বাবা-মা'র স্নেহের ছায়ায় সান্ত্বনা খুঁজতে। ---- প্রফেসার দেব খাম থেকে চিঠিখানা বার করে চোখ বুলোলেন একবার। তারপর কাগজ কলম নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলেন।

বিহার থেকে দিল্লী। দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে শুধু নয়, যেন সম্পূর্ণ আলাদা জগতে এসে পড়েছে ত্রিদিব। অধ্যাপক ত্রিদিব এখন পুরো দস্তুর অফিসার। তবে ফেলে আসা জগৎটা একেবারে হারিয়ে যায়নি। পুরোনো বন্ধুদের সাথে যোগসূত্র অটুট আছে, চিঠিপত্রে খবরাখবরের আদানপ্রদান চলে নিয়মিত।

ধীরেশের চিঠিতে খবর পেলো প্রফেসার দেব নাকি শেষ অবধি সত্যিই রিটায়ার করেছেন এবার। ঝাড়গ্রামে জমি আছে ওঁর, সেখানেই বসবাস করবেন। ঠাট্টা করে বলেছিলেন, এতদিন বখা ছেলেদের উপদেশ দিয়ে এসেছেন, "লেখাপড়া ছেড়ে লাঙ্গল ধরো, দেশের উপকার হ'বে"

---- তা নিজেই নাকি লাঙ্গল ধরবেন এবার। আর তাতেও যদি মন না ভরে, গরু রাখবেন। সারা জীবনই তো গরু চড়িয়ে কাটালেন, সেই অভ্যাসটাই বজায় রাখবেন না হয়। এত ঠাট্টা তামাশা করেও নাকি ফেয়ারওয়েলের সময় কেঁদে ফেলেছিলেন প্রফেসার দেব। তাঁর বিদায় সংবর্ধনায় যারা উপস্থিত ছিল, তাদের চোখও শুকনো ছিল না। তাঁকে বাদ দিয়ে কলেজটা যেন কল্পনাও করা যায়না ----।

এর কিছুদিন পর সুধাংশুর চিঠিতে জানতে পেলো সেই রোমহর্ষণ ঘটনার কথা ----- অরবিন্দ খুনের দায়ে ধরা পড়েছে। হানিমুন থেকে পুলিস টেনে এনেছে ওদের। এক বেনামী চিঠিতে নাকি পুলিস অলকার মৃত্যু সম্বন্ধে অনেকগুলো তথ্য পায়। অলকা সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে মরেনি, অরবিন্দ ওকে জলে ডুবিয়ে মেরেছে। কাঁধে ফিক লাগায় তার পক্ষে সাঁতার কাটতে নামা অসম্ভব ছিল। ---- অলকা শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হয়। তার বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে অলকার কাকারা তার ভরণপোষণ-লেখা পড়ার খরচ চালিয়েছেন। বিয়ের পর বাবার উইলের চুক্তিমত অনেক টাকা হাতে আসে অলকার। অরবিন্দ কোনক্রমে এই উইলের কথা জানতে পেরেছিল এবং শুধু টাকার লোভেই বিয়ে করেছিল অলকাকে, প্রেমের অভিনয় করে। টাকাটা হস্তগত হতেই অলকা নিস্প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো তার কাছে। তাছাড়া অলকার স্বামী হিসেবে সর্বদা ভদ্রতা ও সততার যে মুখোশ তাকে পড়ে থাকতে হ'ত তাও অসহ্য হয়ে উঠলো ক্রমশ।

মিস ভদ্রের সঙ্গে গোপনে লীলাখেলা চালু ছিল বরাবর। বাপের হার্ট অ্যাটাকের কথা বলে রঘুনাথপুরে হোটেলে ওর সঙ্গেই কাটিয়েছে দিনগুলো। অরবিন্দের বাবার মোটেও হার্ট অ্যাটাক হয়নি এবং ছেলের কাছে ট্রাঙ্ককলও পাঠাননি তিনি। ছেলের দুশ্চরিত্রতার জন্যই তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন, অলকাকে বিয়ে করার জন্য নয়। অলকাকে হত্যা করার পরিকল্পনা বহুদিন থেকে ফেঁদেছিল অরবিন্দ, শুধু সাহসে কুলোয়নি এতদিন। এই কুমতলব নিয়েই প্রফেসার দেবকে তাঁর পুরোনো ফ্ল্যাট থেকে কায়দা করে সরিয়েছিল কারণ ভদ্রলোক অলকাকে সন্তান স্নেহে আগলে রাখতেন সর্বদা। তাছাড়া তাঁর মারফৎ বেফাঁস কিছু অলকার কানে আসাও বিচিত্র ছিলনা।

বহুদিন ধরে প্ল্যান ভাঁজছিল অরবিন্দ। ইতিমধ্যে মিস ভদ্র সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ায় সে প্ল্যান কার্যকরী করার তাড়া পড়লো কারণ শাল দোশালা চাপিয়ে বেশীদিন ব্যাপারটাকে গোপন রাখা সম্ভব ছিল না আর। প্রিয়দর্শিনী পার্কের ফ্ল্যাটটা আগে থেকে আগাম দিয়ে বুক করে রেখেছিল অরবিন্দ। নতুন বউকে নিয়ে আনকোরা নতুন সংসার পাতবে বলে। বাড়িওলাকেও যে পুলিস সাক্ষি দিতে ডাকবে একথা কে ভেবেছিল! অরবিন্দ নাকি পুলিসের কাছে সবকিছু স্বীকার করেছে। উপস্থিত, বিচারের অপেক্ষায় হাজতবাস করছে সে ----।

চিঠি পড়ে ত্রিদিব স্তম্ভিত, বজ্রাহতের মত বসে রইলো। তার সহপাঠী, সহকর্মী অরবিন্দ কিনা একটা খুনী! আশ্চর্য, কেমন মুখোশ এঁটে ছিল এতদিন! হঠাৎ তার মানসপটে ভেসে উঠলো প্রফেসার দেবের টেবিলের উপর রাখা খামটার ছবি। ভদ্রলোক বড্ড বকবক করতেন। কথা বলতে বলতে খেঁই হারিয়ে যেত, সামান্য কথা থেকে কাহিনী-উপকাহিনী বার হ'ত, বড় বড় সেকেলে শহরের গলিঘুঁজির মত। ওঁর কথার স্রোতে নাকানি চুবোনি খেয়ে দম বন্ধ হ'বার জোগাড় হ'ত শ্রোতাদের। ফলে ইদানীং ওঁকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতো সবাই। আড়ালে বলতো, "সেনাইল। বাহাত্তুরে ধরেছে লোকটার।" কে জানে, হয়তো সেটাও একটা মুখোশ ছিল! তা নাহ'লে অরবিন্দের মুখোশটা এভাবে খুলতো না আজ।

সেদিন সেই খামের উপর লেখা ঠিকানাটা পড়েছিল ত্রিদিব।